বিশ্বাসের ভালমন্দ

দিগন্ত সরকার

সব মানুষই কিছু বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়। আমরা বড় হওয়ার পথে অনেক কিছুকেই জানি বলে ধরে নিই, পড়ার বই থেকে জানা তথ্য বা বাবা-মায়ের কাছ থেকে শোনা গল্প - সবই আমাদের জ্ঞানের ঝুলিতে জমা পড়ে। বিশ্বস্ত সূত্রে আসা জ্ঞান নির্বিচারে আমাদের মনে গেঁথে যায়। কিন্তু কখনও যদি ভেবে দেখা যায় যে কেন আমরা এগুলো জানি বলে ধরে নিই - বা কেন বিশ্বাস করি? কেন 'বিশ্বাস' করি যে আমাদের পৃথিবী সূর্যের একটা গ্রহ আর সেটা সূর্যকে পরিক্রমা করে, বা সূর্য হল একটা জ্বলন্ত অগ্নিবলয়? এর কারণ হল প্রমাণ। এই প্রমাণ হলো পর্যবেক্ষণলব্ধ প্রমাণ। মহাকাশচারীরা মহাকাশে গিয়ে দেখেছেন যে পৃথিবী গোল। পর্যবেক্ষণে কখনও আবার যন্ত্রের সাহায্য লাগে। সূর্য যে একটা জ্বলন্ত অগ্নিবলয় অথবা সন্ধ্যাতারা দেখতে জ্বলজ্বলে হলেও সেটা আসলে শুক্রগ্রহ - দূরবীন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে তা প্রমাণ করা যায়।

প্রমাণ আবার সবসময় সরাসরি পর্যবেক্ষণলব্ধ হবে তাও ঠিক নয়। খূনের কেসে অনেকসময়েই খূনী আর খূন হওয়া ব্যক্তি ছাড়া আর কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী থাকে না। কিন্তু গোয়েন্দারা অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ একত্র করে কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। যেমন, কোনো ব্যক্তির হাতের ছাপ যদি ছুরিতে পাওয়া যায় তাহলে বলা যায় যে সে সেটা ধরেছিল। যদিও এতে প্রমান হয়না যে সেই খুনী, তবে এর সাথে আরও প্রমাণ একত্র করে, তা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে সেই খুনী।

বিজ্ঞানীরা ঠিক এই গোয়েন্দাদের মতই কাজ করেন। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রথমে কোনো প্রকল্প নেওয়া হয় - ধরা হয় সেটাই সত্যি। তারপরে, সেই আপাত সত্য থেকে আরো বিস্তৃত করে ভাবা হয় - যদি এটা সত্যি হয় তাহলে আরও কি কি সত্যি বলে মেনে নিতে হয়। যেমন পৃথিবী যদি গোল হয়, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে কোনো পর্যটক টানা একি দিকে ভ্রমণ করলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসবে। আবার একজন ডাক্তার প্রথমে রোগীকে দেখে প্রাথমিক ধারণা করেন - যে এই ব্যক্তির এই রোগ হয়েছে। তারপরে তার ওপর বিভিন্ন পরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণ করেন - জ্বর মাপেন, বুকে স্টেথোস্কোপ দিয়ে দেখেন বা শরীরের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা দেখেন। কখনও এক্সরে বা ব্লাড টেস্ট বা আরও জটিল কোনো পরীক্ষা করার দরকারও পড়ে।

ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাস শুধু প্রমাণ বা পর্যবেক্ষণ থেকে আসেনা - আসে ট্র্যাডিশন থেকে, সর্বসাধারণের মান্যগণ্য ব্যক্তিদের থেকে বা কারও ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে। প্রথমে ট্র্যাডিশনের কথায় আসা যাক। ট্র্যাডিশন হল পুরুষানুক্রমে চলে আসা জ্ঞান বা বিশ্বাস। এর একটা ভালো উদাহরণ হল ভারতীয় হিন্দু-সমাজের বর্ণাশ্রম, বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত যেকোনো ধর্মগ্রন্থ। এর কিভাবে শুরু তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, হয়ত কেউ প্রথমে এদের শুরু করেছিল। আর মানুষ তাতে বিশ্বাস করে কারণ কয়েক শতক ধরে এই বিশ্বাস চলে আসছে। সেই প্রাথমিক বিশ্বাস যদি সত্যি হয় তাহলে ট্র্যাডিশন ও সঠিক, আর যদি তা বানানো হয়, তাহলে শতকের পর শতক সেই বানানো গল্পেই মানুষ বিশ্বাস করে চলবে। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করেন - কেউ হিন্দু, কেউ মুসলিম, খৃষ্টান, বা কেউ ইহূদী। এদের নিজেদের কিছু কিছু বিশ্বাস আছে। কিন্তু সেই বিশ্বাস প্রমাণভিত্তিক নয়, ট্র্যাডিশন-ভিত্তিক।

বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য বলে মেনে নেওয়া বা বিশ্বাস করা হল আরও একটি বিশ্বাসের উৎস। যেমন রোমান

ক্যাথলিক চার্চ-এর প্রধান পোপ-এর বক্তব্য অনেক খ্রিষ্টান বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেন, অনেক মুসলিম মেনে নেন মুফতি বা আয়াতোল্লাদের কথা। অনেক ধর্মগুরু নির্দেশ দেন কখনও বিধর্মীদের হত্যা করতে, নিচু জাতকে মন্দিরে প্রবেশ না করতে দিতে বা জন্মনিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে থাকতে। এসব মেনে চলতে গেলে মানবজাতির বিপদ - মানুষে-মানুষে বিভেদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে। বিজ্ঞানের বইতেও অনেক সময়ে অনেককিছুকে প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিতে বলে - যেমন বইতে লেখা থাকে আলোর গতিবেগ হলো ১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড। কিন্তু বিজ্ঞানে, এসব ক্ষেত্রেও যে কেউ এই বক্তব্য পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারে - পরীক্ষার ফলাফল না মিললে মূল বক্তব্যের বিরুদ্ধে নিজস্ব বক্তব্য এবং প্রমাণ পেশ করতে পারে। অথচ, পোপ-এর বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা যায়না - তাই কারোর বক্তব্যে অন্ধবিশ্বাস করা নিজেকে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার দাসে পরিণত করার সামিল।

আর আছে উপলব্ধিগত সত্যি। দীর্ঘসময় ধরে প্রার্থনা করতে করতে কেউ কেউ উপলব্ধি করেন যে এই বিশ্ব এক ঈশ্বরের সৃষ্টি, এক অপরিসীম শক্তি তাকে চালনা করে। সেই শক্তিকে কেউ দেখেনি, তার প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ কোনো প্রমাণ নেই - তবুও সে তার সেই উপলব্ধির বিশ্বাসে অনড় থাকে। অনেক সময়ে বলা হয় যে ভালবাসাও এরকমই এক উপলব্ধি, আর তার সাথে প্রমাণের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এটা একেবারেই যুক্তিসঙ্গত নয়। সময়ে-সময়ে ভালবাসার যে বহিঃপ্রকাশ দেখতে পায় মানুষ, সেটাই তার মনে উপলব্ধির জন্ম দেয়। চোখের দৃষ্টি, গলার স্বর, মধুর ব্যবহার - এ সবই প্রমাণ হিসাবে কাজ করে। আবার অনেক সময়ে প্রমাণ ছাড়াও ভালবাসার উপলব্ধি আসতে পারে, কিন্তু সেই উপলব্ধি অধিকাংশ সময়েই ভুল পথে নিয়ে যায়। কারোর মনে হতে পারে যে কোনো বিখ্যাত চিত্রতারকা তার প্রেমে পড়েছেন। এধরনের উপলব্ধি যদি প্রমাণ ছাড়াই মনে আসে, তাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

ট্র্যাডিশনে আরো একবার ফিরে আসা যাক। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, পুরুষানুক্রমে আসা বিদ্যা তাই মানবসমাজে গুরুত্বপূর্ণ। ইলিশ মাছ যেমন নোনাজলে বেঁচে থাকে, কই মাছ পাঁকে বা রুই মাছ পুকুরের জলে, সেরকমই মানুষ বেঁচে থাকে আরও মানুষের সাথে, সমাজবদ্ধ হয়ে। মাছের বেঁচে থাকার জন্য যেমন ফুলকা বা কানকো লাগে, মানুষেরও সমাজে বাঁচতে গেলে কিছু জ্ঞান লাগে যা তাকে পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে ভাব-বিনিময় করতে সাহায্য করে - যেমন ভাষা। বাংলাদেশের মানুষ বাংলায় কথা বলে, উত্তর ভারতে হিন্দিতে, দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন দ্রাবিড় ভাষায় আবার কিছুটা দূরে চিনে সম্পূর্ণ আলাদা চিনা ভাষায় কথা বলে। বাংলায় যাকে নুন বলে তাকেই হিন্দিতে নমক বলে - এদের একটা অন্যের চেয়ে বেশি সত্যি নয়, এটা এক-এক সমাজের ট্র্যাডিশন থেকেই আসে। আর, শিশুরা এধরনের জ্ঞান ছোটোবেলায় দ্রুত শেখে, ঠিক-বেঠিক বিচার না করেই শেখে - সমাজে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। একই ভাবে ভূত-পেত্নী-দত্যি-দানোতে বিশ্বাস করতে শেখে। বড়রা যেমন বলে, বাচ্চারাও তেমনই শিখতে থাকে। কখনও বড়রা প্রমাণ-ভিত্তিক সত্যি শেখাতে চেষ্টা করে। কিন্তু যদি তারা মিথ্যে, এমনকি ক্ষতিকর উপদেশও দেয়, বাচ্চারা তাও আত্মস্থ করে নেয়। বড় হয়ে তারা আবার সেই একি উপদেশ তাদের বাচ্চাদেরও দেয় - এভাবেই চলতে থাকে। সুতরাং, কোনো কারণ ছাড়াই মিথ্যে আর ক্ষতিকর বিশ্বাস মানুষের সমাজে চিরকালের জন্য জায়গা করে নিতে পারে - এই ট্র্যাডিশনের হাত ধরে।

ধর্মও এরকমই একটা পুরুষানুক্রমে আসা বিশ্বাস। ঈশ্বরে বিশ্বাস করা, স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করা বা প্রার্থনা করে ফল পাওয়া - এসবের কোনো প্রমাণ নেই। শিশুবেলায় শেখে বলে মানুষ এতে বিশ্বাস করে চলে। এক-এক দল মানুষের এক-এক ধরনের বিশ্বাস। মুসলিম শিশুরা, খ্রিষ্টান শিশুরা বা হিন্দু শিশুরা আলাদা বক্তব্য শুনে বড় হয়, আর মনে করে তাদের চিন্তই ঠিক আর অন্যেরা ভুল। তাদের বিশ্বাসের ভিন্নতা ভাষার ভিন্নতার সহধর্মী - নিজেদের সমাজে তাদের নিজেদের বিশ্বাসই চলে - যেমন বাংলাদেশে

বাংলাভাষা আর উত্তর ভারতে হিন্দি। কিন্তু ভাষার মত ধর্ম এক-এক দেশের জন্য ঠিক হতে পারে না - আলাদা আলাদা ধর্ম বিপরীতধর্মী দাবিও করে।

এতসব পড়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এবিষয়ে আমাদের কি করণীয় থাকতে পারে? খুবই সাধারণ একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। এর পর থেকে কেউ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবে, তখন ভেবে দেখা উচিত যে এই বক্তব্য কি প্রমাণভিত্তিক? না এটা ট্র্যাডিশনে আসা জ্ঞান। আর কেউ যদি কোনও কিছুকে সত্যি বলে দাবি করে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে তার কাছে এর স্বপক্ষে কি প্রমাণ আছে। যদি তার উত্তর সদর্থক না হয়, তাহলে সে বক্তব্য বিশ্বাস করার আগে ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে।